সমকাল

তারিখ .. 15 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির তদন্ত হয় শাস্তি হয় না

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবছর বড় ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি হলেও তদন্তে প্রমাণিত 'রুই-কাতলা'দের কোনো শাস্তি হচ্ছে না। দেখা গেছে, অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনায় তদন্ত কমিটি হলেও কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের চাপে তদন্ত কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। কখনও কখনও তদন্ত রিপোর্টে রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করেছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি অনেকটা লাগামহীনভাবেই বাড়ছে। এ বছরের প্রথম পাঁচ মাসেই ফাইলবন্দি হয়েছে ডিআইর সাড়ে পাঁচশ' তথ্য প্রতিবেদন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে— বিশ্ববিদ্যালয়ে বেপরোয়া নিয়োগ-বাণিজ্য, কেনাকাটায় হরিলুট, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার তহবিল তছরুপ, ভর্তি দুর্নীতি, প্রতিষ্ঠানের টাকায় ব্যক্তির নামে অ্যাকাউন্ট খোলা, কোচিং ও সেশন ফির নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে গলাকাটা ফি আদায়, নিয়োগে অনিয়ম, কেনাকাটায় বড় ধরনের অনিয়ম, নিম্নমানের সহায়ক বই শিক্ষার্থীদের গছিয়ে দিয়ে প্রকাশকদের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ, জাল সনদে চাকরি, ভুয়া এমপিওভুক্তি।

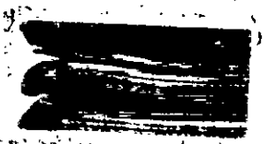

পাঁচ মাসেই ফাইলবন্দি ডিআইএর সাড়ে ৫শ' তদন্ত প্রতিবেদন

সমকালের অনুসন্ধানে গত পাঁচ মাসের তথ্যে দেখা গেছে, দুর্নীতির দায়ে দু-একটি ঘটনায় শিক্ষকদের দু-একজনের এমপিওর

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির তদন্ত হয়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

টাকা বন্ধ করা হয়েছে। অথচ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির এজন্য দায় নিতে হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির ব্যাপকতা আরও বেশি হলেও এর দায়ে কারও কখনও সাজা হয়নি। ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) নিয়ে ৬ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি একসঙ্গে ৩১৭ জনকে গণনিয়োগ দিয়েছেন উপাচার্য (তৎকালীন) অধ্যাপক রফিকুল হক। বাকৃবি উপাচার্য তার খেয়ালখুশিমতো নিয়োগ দিয়েছেন। এমন কিছু ভৌতিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যা অতীতে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে কি-না তদন্ত কমিটির জানা নেই। কারিগরি পদে এমন সব লোককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যাদের ওই পদ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাই নেই। তারা ওইসব পদে আবেদনও করেননি। কোনো কোনো বিভাগ ও অনুষদ থেকে জনবলের চাহিদা না দেওয়া সত্ত্বেও উপাচার্য সেখানে জনবল নিয়োগ দিয়েছেন। ইউজিসির নিষেধাজ্ঞার পরও উপাচার্য নিয়োগ আদেশ স্থগিতের বিষয়ে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছেন। মিথ্যা সার্কুলার দিয়ে বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিভিন্ন পদের চাহিদা আনার অপচেষ্টা করেছেন। বাকৃবির সুলতানা রাজিয়া হলের একজন নারী কম্পিউটার অপারেটরের সঙ্গে উপাচার্যের কেলেঙ্কারিও তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় উইংয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত এক মাসেও সাবেক উপাচার্য ড. রফিকুল হকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

১২ এপ্রিল রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে ইউজিসি। ওই তদন্ত রিপোর্টে উপাচার্য অধ্যাপক শাদাত উল্লার বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তা হচ্ছে— নিয়োগে অনিয়ম, ৩০ পদের অনুমোদন নিয়ে ৭৫ জনকে নিয়োগ, নিয়োগের বেলায় অর্থের লেনদেন, আত্মীয়স্বজনকে অবৈধভাবে নিয়োগ, আর্থিক অনিয়ম ও গাড়ি ব্যবহারে অনিয়ম। নিজ প্রাপ্যতার বাইরে এই উপাচার্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করেছেন তা সরকারি কোষাগারে ফেরত নেওয়ারও সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। এই তদন্ত রিপোর্টও ফাইলবন্দি হয়ে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের তদন্ত রিপোর্টও লালফিতায় বন্দি হয়ে আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি উদ্‌ঘাটনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) পরিচালক অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমেদ সমকালকে জানান, শুধু গত (মে) মাসে তারা ১৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন। তারা শুধু সুপারিশ করতে পারেন। ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ১৬০টি তদন্ত রিপোর্টই ফাইলবন্দি হয়ে আছে। কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বছরের প্রথম পাঁচ মাসে ডিআইএ প্রায় সাড়ে ৫শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তদন্ত কাজ সম্পন্ন করেছে। অথচ একটির বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি মন্ত্রণালয়। আরও প্রায় ৭০টির মতো প্রতিষ্ঠানে তদন্ত চলছে। 'কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না' জানতে চাইলে একজন যুগ্ম সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে সমকালকে বলেন, বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি স্থানীয় এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান কিংবা রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ব্যবস্থা নিতে গেলেই চাপ আসে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রাজধানীসহ সারাদেশের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দুর্নীতির ব্যাপকতা বেশি। এর মধ্যে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উদয়ন হাইস্কুল এবং নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজেও অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠানে ডিআইএ একাধিকবার তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তবে এসব তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ পায়নি। মন্ত্রণালয়ও ব্যবস্থা নেয়নি। কয়েকজন শিক্ষা পরিদর্শক সমকালকে জানান, রাজধানীর আলোচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদের প্রতিটিতে প্রভাবশালীরা সংশ্লিষ্ট। ফলে মন্ত্রণালয় কিংবা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) প্রতিষ্ঠানগুলোর অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মনিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে অননুমোদিতভাবে দুটি শাখা পরিচালনা করে এলেও স্থানীয় এমপিরা সভাপতি হওয়ায় মন্ত্রণালয় উচ্চবাচ্য করছে না। ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদে মদদ দেওয়ার তথ্য পেয়েছে ডিআইএ তদন্ত দল। বিএএফ শাহীন স্কুল ও টঙ্গীর সফিউদ্দিন সরকার একাডেমির বিরুদ্ধে চলমান এইচএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁসের সত্যতা পাওয়া গেছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে গত মাসে তদন্ত শেষ হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, দুর্নীতির ব্যাপারে সব ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদেরও রেহাই পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে মন্ত্রণালয়ের কাজের চাপের পরিধি ব্যাপক হওয়ায় ব্যবস্থা নিতে কিছুটা সময় লাগতেই পারে। এ সময়টুকু দিতেই হবে।